প্রচলিত বিভিন্ন খতম তাৎপর্য ও পর্যালোচনা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ অভিজ্ঞতা বনাম ধর্মীয় অনুভূতি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

অভিজ্ঞতা বনাম ধর্মীয় অনুভূতি

উল্লেখিত প্রচলিত খতমসমূহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা বহির্ভূত খেলাফে সুন্নাত স্বীকার করা সত্বেও তা জায়েয বা এতে কোনো সমস্যা নেই এর পক্ষে যে দলীল পেশ করা হয় তা হলো, অভিজ্ঞতা। আলেমগণের এক শ্রেণি ঈসালে ছওয়াবের খতমে অংশ নিলেও তা বিদ‘আত মনে করেন। কেননা তারা জানেন যে, খাইরুল ক্বুরুনে খতমের মাধ্যমে ঈসালের কোনো পদ্ধতি ছিল না, তবে তারা ঈসালে ছওয়াব ছাড়া অন্যান্য সমস্যার কারণে যে কোনো খতম করতে কোনো সমস্যা নেই বলে মনে করেন। তাদের যুক্তি হলো, এটি একটি তাজরিবাহ বা অভিজ্ঞতার বিষয়। এর সাথে বিদ‘আতের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা বিদ‘আতের সম্পর্ক ইবাদতের সাথে। খতম যদি ইবাদতের উদ্দেশ্যে না করা হয়, বরং রোগমুক্তি বা অন্য উদ্দেশ্যে করা হয় তবে নাজায়েয হওয়ার কোনো কারণ নেই। এগুলো বিভিন্ন বুযুর্গের অভিজ্ঞতা মাত্র। অভিজ্ঞতার আলোকে অমুক খতমে অমুক ফল দেখা গেছে, তাই আমরা সেই আশায় খতম পড়ছি।

যে কোনো খতম পড়তে কোনো সমস্যা নেই একথা কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা আমরা খতমের আলোচনায় বুঝতে পেরেছি। এবার হলো যে খতমে শব্দগত কোনো আপত্তি নেই তার কথা। অভিজ্ঞতার আলোকে এমন খতমাদিকে শুদ্ধ বলে চালানো কতটুকু গ্রহণযোগ্য? মূলত অভিজ্ঞতা ও ধর্মীয় অনুভূতি দুটি বিষয়কে এক করে দেওয়ার ফলে আমরা এমন কথা বলি, অথচ দুটি বিষয়ে আকাশ পাতাল ব্যবধান। ইবনে তাইমিয়া রাহ.[1] বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। ইবনে তাইমিয়া রাহ. এর আলোচনা পেশ করার আগে সহজেই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

মূলত কোনো জিনিসের সাথে বারংবার সম্পৃক্ত হওয়া, সেই বস্তুকে নিয়ে গবেষণা, পরীক্ষা নিরিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত বস্তুর ভিতর বাস্তব যে প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় তাকে বলে অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার আলোকে কোনো কিছু প্রমাণিত হলে তা উক্ত বস্তুর বৈশিষ্ট্য। তাই তা অস্বীকারের কারো কোনো উপায় নেই। পাগল ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না। কেউ স্বীকার করুক বা নাই করুক, বিশ্বাস করুক বা নাই করুক, উক্ত বস্তু তার কাজ করেই যাবে। এখানে ধর্মের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন ধরুন, আগুনের ভিতর জ্বালানোর বৈশিষ্ট্য মানুষ প্রথমে অভিজ্ঞতার আলোকেই পেয়েছে। আগুন জ্বালায় এ কথা সবাই মানেন। এভাবে যে কোনো রোগের ঔষধ অনেক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে অমুক ঔষধ খেলে অমুক রোগ ভাল হওয়ার বৈশিষ্ট্য আল্লাহ সেই ঔষধে রেখেছেন। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হলে মুসলিম, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ সবাই তা স্বীকার করেন। কেননা এটা সেই বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তাই অভিজ্ঞতা সঠিক হলে সবাই তা স্বীকার করতে বাধ্য। অপরদিকে ধর্মীয় অনুভূতি এমন যা একজন বিশ্বাস করলে অপরজন করেন না। যেমন ধরুন, একটি অত্যন্ত সুন্দর পাথর, হিন্দু ধর্মের ব্যক্তি তাকে খুবই শ্রদ্ধা করছেন। তিনি বলছেন, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এই পাথর থেকে এই ফল পাওয়া যায়, এর অসম্মান করলে এই ক্ষতি হয়। অপর ব্যক্তি যিনি এই ধর্মে বিশ্বাসী নন তিনি এই পাথরকে লাথি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন। কেননা হিন্দু ব্যক্তি যে বিশ্বাস পোষণ করেন তিনি তা করেন না।

পাথরকে লাথি মারলেও তার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। হিন্দু ব্যক্তির কথাটি বাস্তব হলে লাথি মারলে এই ব্যক্তিরও ক্ষতি হওয়ার কথা ছিল। এখানে হিন্দু ব্যক্তির ধারণাকে আমরা অভিজ্ঞতা বলতে পারি না। বরং তা তার একটি ধর্মীয় বিশ্বাস। সে যদি পাথরকে শ্রদ্ধার কারণে কোনো লাভ, অপমান করার কারণে কোনো ক্ষতির বাস্তব ঘটনা শুনায় তবুও মুসলিম তা উড়িয়ে দিবেন, এমনকি তা নিয়ে হাসির কৌতুকও রচনা করতে পারেন। তিনি বলবেন মূলত লাভ ক্ষতি অন্য কারণে হয়েছে, হিন্দু ব্যক্তির বিশ্বাস তাকে এদিকে টেনে নিয়ে গেছে। এই হলো অভিজ্ঞতা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্য।

এভাবে যে ব্যক্তি মাজারে নিয়মিত আসা যাওয়া করে, মাজারকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তাকে আপনি এর খারাবী বুঝাতে চেষ্টা করলে বা এখানে এসে কোনো লাভ নেই বললে সে আপনাকে তার অনেক লাভ দেখিয়ে দিবে। সে বলবে আমি এই পেয়েছি, সেই পেয়েছি। শাহজালাল বাবার কাছে চাইলে পাওয়া যায় বলে আমার কাছে অনেক প্রমাণ রয়েছে। এ কথাগুলো কোনো কাল্পনিক বা ধরে নেওয়ার ভিত্তিতে নয় বরং বাস্তব। আমার নিজ কানে সিলেটের অনেককেই বলতে শুনেছি, এত লোক কি এখানে এমনিতেই আসে? নিশ্চয় তারা কিছু পায়। আমাদের ঘরের জিনিস তাই আমরা এর ক্বদর তথা মূল্যায়ন করি না। এখানে সে তাঁর অভিজ্ঞতা দেখালেও সহীহ আক্বীদা পোষণকারী মুসলিম তা বিশ্বাস করেন না। মাজার বিশ্বাসী লোকটির এমন কথা আপনার হাসি ও আক্ষেপকেই বৃদ্ধি করে। আপনি এটিকে তাঁর একটি বোকামী বলেই দেখছেন। কেননা এটা তাঁর মনের তৈরী একটি বিশ্বাস যার কোনো প্রমাণ নেই। প্রথমে বিশ্বাস তৈরীর পর সে তাঁর লাভ ক্ষতিকে মাজার কেন্দ্রিক টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে যতই অভিজ্ঞতার কথা বলুক না কেন আপনাকে তা বিশ্বাস করাতে পারবে না। তার কারণ হলো, এটাকে অভিজ্ঞতা নাম দিলেও প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এটিও তাঁর একটি ধর্মীয় অনুভূতি বা বিশ্বাস। এভাবে হাজারো উদাহরণ আপনি নিজেই চিন্তা করলে বের করতে পারবেন, যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাসকে অভিজ্ঞতার নাম দিয়ে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। কুরআন হাদীসের বিপরীত যত ভ্রান্ত আক্বীদা রয়েছে তার অধিকাংশই এ পর্যায়ের।

আরেকটি উদাহরণ দেখুন: 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু করলে খাবারের মাঝে বরকত হয় বলে আমরা মুসলিম হিসেবে বিশ্বাস করি। কেননা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বলে গেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে ব্যক্তি নবী বলে অস্বীকার করে সে এটি বিশ্বাস করবে না। মুসলিম ব্যক্তি বাস্তবে এই বরকত উপলব্ধি করলেও তিনি এখানে অভিজ্ঞতার দলীল দিতে পারেন না। কেননা এটা অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। অভিজ্ঞতার বস্তু হলে মুসলিম অমুসলিম সবাই তা বিশ্বাস করতে বাধ্য। বরং এটি মুসলিম ব্যক্তির একটি ধর্মীয় বিশ্বাস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলার কারণে তিনি এই বিশ্বাস পোষণ করেন। আল্লাহ বা রাসূল ছাড়া অন্য কেউ বললে এই একই ব্যক্তি তা উড়িয়ে দিতেন। কেননা ওহী ছাড়া ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ করা যায় না। ওহীর বাইরের আক্বীদা মানেই ভ্রান্তি। ধরুন আমি বুযুর্গির এক পর্যায়ে পৌছে যদি বলি 'ক্বুল হুয়াল্লাহু...' পড়ে খাবার শুরু করলে খাবারে বরকত হয়। এখন দেখা যাবে আমার কিছু অন্ধ ভক্ত একথা বিশ্বাস করবেন এবং তারাও এর আলোকে আমল শুরু করবেন। একথা বিশ্বাস করতে কোনো সমস্যা নেই দাবী করে দলীল হিসেবে বলবেন, এটা উনার অভিজ্ঞতা। তবে যিনি মুহাক্কিক আবার অন্ধ ভক্ত নন, বরং শরীয়তের সীমার ভিতরে থেকে ভক্তি করেন, তিনি এ কথা মেনে নিবেন না। কেননা তিনি জানেন যে, এটা অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। এখানে একটি বিশ্বাসকে অভিজ্ঞতার নাম দেওয়া হয়েছে মাত্র। ওহীর বাইরে এমন কথা তিনি মেনে নিবেন না। তবে 'বিসমিল্লাহ' এর বরকত ওহী দ্বারা প্রমাণিত, তাই তিনি তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এবং আমল করেন। আশাকরি ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতার মাঝে পার্থক্য বুঝতে আর কোনো উদাহরণের প্রয়োজন নেই। এবার পাঠক নিজেই

বিভিন্ন খতমের ব্যাপারে ফায়সালা করুন। এই খতমে এই হয়, সেই খতমে সেই হয়, তা কি অভিজ্ঞতার বিষয়? না কি একটি ধর্মীয় বিশ্বাস? দ্বিতীয়টি হলে -আপনি অন্ধ ভক্ত না হলে এটাই আপনার কাছে বাস্তব- ওহী ছাড়া আমরা এমন বিশ্বাস ও তার উপর আমল কীভাবে করতে পারি?

একটি ঘটনা দেখুন: চট্টগ্রামের জনৈক ব্যক্তি লন্ডন বসবাস করেন। দেশে আসলেই তিনি সিলেট আসেন এবং শাহজালাল রাহ. এর মাজার যিয়ারত করেন। দেশে আসলে কোনো বারই নাকি তাঁর এই সফর মিস হয় না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ভাই আপনি কেন আসেন? এর প্রতি উত্তরে লোকটি বলল, ‘‘বাবা আঁরে লন্ডন ফাটাইয়ি ইতাল্লাই আঁই ফতিবার এডে আঁই’’ অর্থাৎ শাহজালাল বাবা আমাকে লন্ডন পাঠিয়েছেন, তাই আমি প্রত্যেকবার তথা দেশে আসলেই এখানে আসি। লোকটির বিশ্বাস দেখুন। সে তাঁর এ কথাগুলো অভিজ্ঞতার আলোকেই বলছে। কেননা সে এখানে এসেছে এবং লন্ডন যাবার জন্য দো‘আ করেছে এবং যেতে পেরেছে। একজন সহীহ আক্বীদা পোষণকারী হিসেবে আপনি লোকটির এই কথাগুলো কিভাবে নিবেন? আপনি সহীহ আক্বীদা পোষণকারী নিশ্চয় বলবেন, তার লন্ডন যাবার অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়ার যাবতীয় জরুরী কাগজপত্র, ভিসা, পাসপোর্ট ইত্যাদি শর্ত মোতাবেক হয়েছে বলে অল্লাহর ইচ্ছায় সে যেতে পেরেছে। লন্ডনের অনুমোনের শর্তাদি পুরো না হলে একবার কেন শতবার মাজারে আসলেও সে যেতে পারত না। কিন্তু এমন লোককে যদি আপনি বলেন: ভাই, এখানে শাহজালাল সাহেবের কী সম্পর্ক? আপনার তো লন্ডন যেতে পারা যাবতীয় শর্তাদি সঠিকভাবে পূরণ হওয়ার কারণে হয়েছে, সে বলবে, কাগজপত্র সবকিছু বাবার ওসীলায় ঠিক হয়েছে। এভাবেই অতিভক্তির মাধ্যমে মানুষ বিশ্বাসের ধোকায় নিপতিত হয়। অতিভক্তি তার বিশ্বাসকে এদিক থেকে ওদিকে নিয়ে যায়। বাস্তবতা থেকে অবাস্তবতার দিকে নিয়ে যায়, অথচ সে টেরই পায় না। আমাদের অবস্থা এমন হচ্ছে কি না তা নিয়ে ভেবে দেখা দরকার। দীনের জন্য একটু ভাবলে ক্ষতিই বা কী? বরং এতে আমার অনেক লাভ রয়েছে। আমি সঠিক পথে থাকলেও ভাবার কারণে নিশ্চয় ছওয়াব পাব।

এবার আমরা ইবনে তাইমিয়া রাহ. এর বক্তব্যটি উপস্থাপন করছি। তিনি লিখেন:

" ثم قد يكون سبب قضاء حاجة هؤلاء الداعين الدعاء المحرم؛ لشدة ضرورته لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له لصدق توجهه إلى الله –تعالى ".) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم1–96)

‘‘এরপর অনেক সময় এসব প্রার্থনাকারী যারা হারাম প্রার্থনা করে তাঁর কঠিন প্রয়োজনের কারণে আল্লাহ তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করেন, যদি কোনো মুশরিক একটি মূর্তির কাছে গিয়ে এই প্রয়োজনের প্রার্থনা করত তাঁর প্রার্থনা ক্বুবল করা হত, কেননা (সে মূর্তির কাছে হলেও) তার পূর্ণ মনোযোগ আল্লাহর দিকে।’’[2]

ইবনে তাইমিয়া রাহ. এখানে যে কথাটি বুঝাতে চেয়েছেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রার্থনাকারী হারাম বস্তু কামনা করছে। আল্লাহ তার মনের আহাজারী, কাতর অবস্থা দেখে এমন প্রার্থনাও শুনছেন। তবে এই বস্তু পেয়ে যাওয়া তাঁর কামনা জায়েয হওয়ার দলীল নয়। এভাবে মূর্তির কাছে গিয়েও সে যে প্রার্থনা করে, তাঁর কান্নাকাটি, আহাজারী, মনের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তার দো‘আ শুনেন। তবে দো‘আ কবুল করা মূর্তির কাছে যাওয়ার কারণে নয়, বরং তার মনের করুণ অবস্থার কারণে। কিন্তু প্রার্থনাকারী লোকটি তার বিশ্বাসকে মূর্তির দিকে নিয়ে গিয়ে ফিতনায় পতিত হয়। সে মনে করে মূর্তির কাছে এসে কিছু চাইলে পাওয়া যায়।

তিনি আরো লিখেন:

ومن هنا يغلط كثير من الناس يبلغهم أن بعض الأعيان الصالحين عبد عبادة، أو دعا دعاء وجد أثره، فيجعل

ذلك دليلا على استحباب تلك العبادة والدعاء، ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي، وهذا غلط عظيم لما ذكرناه خصوصا إذا كان العمل إنما كان أثره بصدق قام في قلب فاعله حين الفعل ثم تفعله الأتباع صورة، فيضرون به.

‘‘এখান থেকেই অনেক মানুষ ভুলের মধ্যে পতিত হয়, যখন তাদের কাছে খবর পৌঁছে, কোনো নেক মানুষ একটি ইবাদত করেছেন, অথবা একটি দো‘আ করে তার ফল পেয়েছেন, অতঃপর এটিকে ঐ ইবাদত এবং দো‘আ মুস্তাহাব হওয়ার দলীল বানিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা সেই আমলটিকে সুন্নাত বানিয়ে নেয়, যেন তা কোনো নবী করেছেন। আর এটা মারাত্মক ভুল যা আমরা উল্লেখ করেছি। বিশেষ করে যখন আমলটির ফল কর্মের সময় আমলকারী মনের নিষ্ঠার কারণে ছিল, পরবর্তীতে অনুসারীরা শুধুমাত্র বাহ্যিক আমল হিসেবে তা করে থাকে, ফলে তারা এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।’’[3]

পাঠক, আশা করি ইবনে তাইমিয়া রাহ. এর বক্তব্য থেকে বিষয়টি আমাদের সামনে আরো স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কোনো বুযুর্গ কোনো দো‘আর আমলের মাধ্যমে কিছু পেলে আমরা তা সেই দো‘আর প্রতিফল ভাবতে পারি না। কেননা ওহী ছাড়া এমন কথা বলা যায় না। তবে নেক বুযুর্গ তিনি যে প্রতিফল পেয়েছেন এটা মূলত তার মনের অবস্থার প্রতিফল। যে কোনো মুমিন মনের আবেগ নিয়ে সকাতরে আল্লাহর কাছে যেই দো‘আ করুক না কেন আল্লাহ তার প্রতিফল দিবেন। এমনকি সকাতরে কাফের ব্যক্তিও যখন আল্লাহর কাছে কিছু চায় আল্লাহ তার প্রতিফল দেন বলে কুরআনে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন।[4]

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বস্তু উপলব্ধি করার তওফিক দান করুন। শুধুমাত্র সুন্নাতের মধ্যেই সফলতা দেখার তওফিক দান করুন। আমীন। আমাদের জানামতে সমাজে কম-বেশ যে খতমগুলো রয়েছে, বা যে দো‘আ দুরূদগুলো খতম হিসেবে পড়ার প্রথা রয়েছে সেগুলো নিয়ে সামান্য পর্যালোচনা করলাম। আলোচনার বিষয়বস্তু মূলত সমাজে বা আমাদের মাঝে প্রচলিত খতম নিয়ে। তাই অন্যান্য বানানো আরো কিছু আমল যেগুলোর প্রচলন রয়েছে তবে তা আমাদের সমাজে খতম হিসেবে প্রসিদ্ধ নয়, সেগুলোর আলোচনা করা হয় নি। যেমন : দুরুদে তাজ, দুরুদে হক্কানী, দুরুদে তুনাজ্জিনা, দুরুদে ফুতুহাত, দুরুদে রু‘ইয়াতে নবী, দুরুদে শিফা, দুরুদে খাইর, দুরুদে আকবার, দুরুদে লাখি, দুরুদে হাজারী, দুরুদে রুহি, দুরুদে বীর, দুরুদে শাফিয়ী, দুরুদে গাওসিয়া, দুরুদে মুহাম্মাদী...। এসব দুরূদ পরবর্তী যুগের মানুষের বানানো। অতএব এগুলোর ফযিলতে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা।[5] তাছাড়া এগুলোর অনেকটির মধ্যে কিছু কিছু আপত্তিকর শব্দও বিদ্যমান। আপত্তির পর্যায়টি না-জায়েয ক্ষেত্র বিশেষে শির্ক পর্যন্ত রয়েছে। তাই এগুলোর চটকদার লাভের গল্প শুনেই তার পিছে না পড়া জ্ঞানী ব্যক্তির কাজ। এগুলোতে আমার আপনার বুযুর্গের ছোঁয়া থাকলেও নবুওয়াতের নুর নেই। তাই নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত দুরূদ ও দো‘আর মাঝে সীমাবদ্ধ রাখাই নিরাপদ। তাযকিয়ার চূড়ান্তে পদচারণা করতে তাঁর শিখানো দুরূদ ও পদ্ধতিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের ভিতর থেকেই দুনিয়ায় থাকাবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট পেয়ে গিয়েছিলেন। তারা যেমন সুন্নাতের বাইরে কিছুই ভাবতে পারেন নি, আমরাও তাদের আদর্শের দাবীদার হলে তাযকিয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাতানো ওযিফার বাইরে কোনো ওযিফা ভাবতে পারি না। বিপদে আপদে আল্লাহর শরণাপন্ন হতে তাঁর আদর্শ ও পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে শরণাপন্ন হতে পারি না। তাঁর বাতলানো পদ্ধতির মাধ্যমে শরণাপন্ন হলেই আল্লাহ আমাদের কথা দ্রুত শুনবেন বলে আমরা আশাবাদী। আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে তো একারণেই আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন যে, আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমরা

কিভাবে, কিসের মাধ্যমে তাঁর কাছে প্রার্থনা করব, কোন পদ্ধতিতে কোন আমলে তাঁর নৈকট্য লাভ করব সেটা আমাদের তিনি জানাবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শের গণ্ডির ভিতর রাখুন। আমীন।

ফুটনোট

[1] শায়খুল ইসলাম আহমদ ইবন আব্দুল হালীম তাক্বীউদ্দীন ইবনু তাইমিয়া। জন্ম: ৬৬১ হিজরী মোতাবেক ১২৬৩ ঈসায়ী, ওফাত:৭২৮ হিজরী, মোতাবেক ১৩২৮। তিনি মূলত হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তাফসীর ও উসুলে তাকে ‘আয়াত’ নিদর্শন বলা হত। (আল-আ‘লাম:/১৪৪) সমস্ত বিশ্বের আলেমদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা, সহীহ আকীদার দওয়াত, প্রচার, প্রসারের ক্ষেত্রে তার তুলনা অত্যন্ত দুর্লভ।

[2] ইব্নু তাইমিয়া, আল-মানহাজুল ক্বাওয়ীম ফি ইখতিছারি ‘ইক্বতিদ্বায়ুসসিরাতিল মুস্তাক্বীম’, কিছু বস্তুর প্রতিক্রিয়ার আলোচনা যা অনেক সময় কম জ্ঞানী ও দুর্বল ধার্মিক ব্যক্তির জন্য ফিতনা হয়, এমনকি তার জ্ঞান ছিনিয়ে নিয়ে যায়, ১/৯৬।

[3] প্রাগুক্ত, ১/৯৭।

[4] দেখুন: সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৬৫, লুক্বমান, আয়াত: ৩২।

[5] প্রখ্যাত হাদীস গবেষক ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির, হাদীসের নামে জালিয়াতী, পৃষ্ঠা: ৬২০।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=11091

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন